

বর্ষায়ন ২০১৫

২ জানুয়ারি শুক্রবার

২০১৫-তে ২৩ তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড। এ উপলক্ষে ২ জানুয়ারি শুক্রবার সারাদেশে ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের উদ্যোগে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা উদযাপন করবেন কোয়ান্টাম বর্ষায়ন।

সবাই যেন সপরিবারে এ আনন্দ আয়োজনে শরিক হতে পারেন, এজন্যে বছরের প্রথম ছুটির দিনটিকেই বেছে নেয়া হয়েছে বর্ষায়ন উদযাপনের লক্ষ্যে। নতুন বছরের প্রথম শুক্রবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দেশজুড়ে বিভিন্ন পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, এসোসিয়েটসহ কোয়ান্টাম পরিবারের সর্বস্তরের সদস্যরা একত্রিত হবেন নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে।

বর্ষায়ন কার্যক্রম শুরু হবে সুখী জীবনের মেডিটেশন দিয়ে। মেডিটেশন ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবার পিঠা-পুলি-মোয়া দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে। এছাড়াও বর্ণিল সাজে সাজিয়ে তোলা হবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলগুলো। শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা বর্ষায়নকে কেন্দ্র করে গ্রহণ করছেন নানারকম প্রস্তুতি।

ফাউন্ডেশনের ২৩ তম বছরকে সুন্দর ও সাফল্যময় করার প্রত্যাশা নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা। রোগশোক, ভ্রান্তবিশ্বাস আর সমস্ত নেতিবাচকতা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে চারপাশের সকলকে সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের সূরে একাত্ম করতেই মূলত এই আয়োজন।

সিলেট ও রাজশাহীতে গুরুজীর পরিচালনায় বিশেষ ওয়ার্কশপ

সিলেট ও রাজশাহীতে গুরুজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের বিশেষ ওয়ার্কশপ।

সিলেট

১৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
স্থান : হোটেল স্টার প্যাসিফিক,
দরগা গেট, সিলেট।

রাজশাহী

২৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার
স্থান : শিল্পকলা একাডেমি
মিলনায়তন, রাজশাহী।



কোয়ান্টাম বুলেটিন

ডিসেম্বর ২০১৪

মাটির ব্যাংক সালতামামি উৎসব ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর

দানে বরকতময় হোক সবার জীবন

দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের উদ্যোগে ডিসেম্বর মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে মাটির ব্যাংক সালতামামি উৎসব। এ উপলক্ষে ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ করসেবা। উৎসবমুখর এ করসেবায় অংশ নেবেন কোয়ান্টাম পরিবারের সর্বস্তরের সদস্য ও এসোসিয়েট।

আমরা বিশ্বাস করি, বঞ্চিতের কল্যাণে দান করা এবং বন্ধু-পরিচিত-আত্মীয়দের কাছ থেকে সম্ভবদ্বারা দান সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে পরম করুণাময়ের এক অফুরান রহমতের স্পর্শ অনুভব করবেন সবাই। নিঃস্বার্থ ও সজ্ঞবদ্ধ দানে বরকতময় হবে আমাদের সবার জীবন।

অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানকে একত্র করতে পারলে সম্ভবদ্বারা অনেক বড় কাজ করা সম্ভব-এ বিশ্বাস নিয়েই ১৯৯৮ সালে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের যাত্রা শুরু। সেই ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের সদস্য, সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা এ কার্যক্রমে অংশ নেন। এতে একদিকে যেমন তারা বঞ্চিত মানুষের জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, স্বনির্ভরায়ন প্রকল্প ইত্যাদি সেবাসেবা কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারছেন, তেমনি নিজেরাও ব্যক্তিগত পারিবারিক পেশাগত সামাজিক সবদিক থেকেই ভালো আছেন, প্রতিনিয়ত অনুভব করছেন করুণাময়ের করুণাধারা। ফলে প্রতিবছরই উত্তরোত্তর বাড়ছে মাটির ব্যাংক দানের পরিমাণ ও সম্মিলিত সংগ্রহ। যার ফলশ্রুতিতে চলমান রাখা সম্ভব হয়েছে দেশজুড়ে নানামুখী ও দূরপ্রসারী সেবামূলক কাজ। যার প্রধান উৎস কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক।

প্রতিবারের মতো এবারও মাটির ব্যাংক সালতামামি উৎসব করসেবায় ফাউন্ডেশনের সদস্যরা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী সহকর্মী ও পরিচিতদের কাছে বিতরণকৃত প্রতিটি মাটির ব্যাংক সংগ্রহ করবেন এবং পৌঁছে দেবেন নতুন ব্যাংক। আর সেই সাথে সবাইকে পৌঁছে দেবেন গুরুজীর শুভেচ্ছা বাণী সম্বলিত নতুন বছরের পকেট ক্যালেন্ডার। আমন্ত্রণ

জানাবেন ২ জানুয়ারি ২০১৫-তে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন বর্ষায়নে।

এবারের করসেবা উৎসবের প্রাক্কালে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বলেন, বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কর্মময় একটি বছর কাটলাম আমরা, তাই এর শুকরিয়া হিসেবে মাটির ব্যাংক জমা দেয়া

ছাড়াও নিয়মিত ব্যয় থেকে সাধ্যমতো বাঁচিয়ে বছরের এই শেষ মাসটিতে এককালীন দান করুন। যার বরকতে স্রষ্টা নতুন বছরে আমাদের নিজেদের ও পরিবারের সবাইকেই সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন ও কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে চলাকে সহজ করে দিতে পারেন। মুক্তি দিতে পারেন সব ধরনের বালা-মুসিবত দুঃখ-শোক রোগ-জ্বরা-ব্যাধি ও কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে। এক অফুরান বরকতে সিন্ধু করে তুলতে পারেন আমাদের সবার জীবন। তাই আপনারা আত্মীয় বন্ধু পরিচিতজনদের মধ্যে যাদের কাছেই মাটির ব্যাংক আছে, সুনির্দিষ্ট তালিকা করে পরিকল্পিতভাবে সেটি সংগ্রহ করুন এবং স্রষ্টার প্রতি শুকরিয়া ও যেকোনো সং নিয়তে নিজে এককালীন দান করুন। অন্যদেরও উৎসাহিত করুন, যাতে পরিবারের সদস্য ও প্রিয়জন সবাইকে নিয়েই আমরা থাকতে পারি তাঁর করুণাধারা।



মহাজাগতিক সফরে
বিশিষ্ট সাংবাদিক
জগলুল আহমেদ
চৌধুরী



দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জগলুল আহমেদ চৌধুরী (৬৫) আর নেই। ২৯ নভেম্বর ঢাকার কারওয়ান বাজারে সংঘটিত এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইনালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। উল্লেখ্য, তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১৩তম ব্যাচে অংশ নেন।

কোয়ান্টাম চেতনার একনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী সাংবাদিক জগলুল আহমেদ চৌধুরী কোর্সে অংশ নেয়ার পর নানাভাবে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বেশ কয়েকবারই তিনি এসেছিলেন গুরুজীর সাথে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট সাংবাদিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ কার্যক্রমে। প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে।

কোয়ান্টাম মেথড ৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস প্রকাশকালে তিনি বলেন-‘মেডিটেশন একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কোয়ান্টাম মেথডও বিজ্ঞানসম্মত বিষয়। কোর্সটি করে আমি মেডিটেশনের মানসিক ও শারীরিক প্রভাব অনুধাবন করেছি। মেডিটেশন মানুষকে বিভিন্মভাবে উজ্জীবিত করে। সারাদেশে তাই মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করা প্রয়োজন।’

আমরা তার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

কোয়ান্টাম মেথড

৩৭৮ তম কোর্স

১৯, ২০, ২১ ও ২২ ডিসেম্বর

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

ভেন্যু : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

বাংলাদেশে আত্ম উন্নয়নমূলক সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব কাজী আনোয়ার হোসেন। 'বিদ্যুৎ মিত্র' ছদ্মনামে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম আত্ম উন্নয়ন ও মন-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করেন। এদেশে রহস্য-রোমাঞ্চ ধারার উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ, 'মাসুদ রানা' ও 'কুয়াশা'-র মতো কালজয়ী গোয়েন্দা চরিত্রের স্রষ্টা, মাসিক রহস্য পত্রিকার সম্পাদক, বৈচিত্র্যময় প্রকাশনা সংস্থা সেবা প্রকাশনীর রূপকার-এমনই নানা বিচিত্র ও বহুমুখী পরিচয় তার। পাঠকের কাছে 'কাজীদা' নামে জনপ্রিয় কাজী আনোয়ার হোসেন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩য় ব্যাচে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ নেন। এর দুদশক পর কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৭৫ তম ব্যাচপূর্তি উপলক্ষে কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তার জীবন ও কর্মের নানা দিক নিয়ে। ব্যক্ত করেছেন ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত মূল্যায়ন।

কাজে লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই

কাজী আনোয়ার হোসেন

শৈশব থেকেই আমি কিছুটা রহস্য-রোমাঞ্চপ্রিয় মানুষ। ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন হবো। সুবিশাল মহাসাগরে অতিকায় এক জাহাজ নিয়ে পাড়ি দেবো অজানা-অচেনা কোনো নির্জন দ্বীপে। সবরকম শাসন-বারণ উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়াব সারা পৃথিবীময়। মনের গভীরের সেই সুপ্ত, দূরন্ত, রোমাঞ্চকর ইচ্ছেগুলোই হয়তো পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়েছে আমার লেখার মধ্য দিয়ে।

পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশের সময় হলো যখন-আমার বয়স তখন ২৬ বছর-ভাবনা এলো, এখন কী করব? একটা কিছু পেশা তো দরকার। সেই সময়ে গান গাইতাম রেডিও-টিভি ও চলচ্চিত্রে, কিন্তু পরিষ্কার জানতাম-নেশার ঘোরে করছি বটে, কিন্তু ওটাকে আমি পেশা হিসেবে নিতে চাই না। শিক্ষকতায় হয়তো যেতে পারতাম, কিন্তু চাকরি করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি অনেক আগেই। তাহলে?

বুঝতে চাইলাম, কোন্ কাজে আমার আগ্রহ আছে? কোন্ দিকে আমার ঝোঁক? কী করতে ভালো লাগে? কীসে সামান্য হলেও দক্ষতা আছে আমার? নিজের ভেতরে এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই চলে এলো : লেখালেখি।

ক্লাস সিলে পড়ি যখন, সেজ বোন আমাকে একটা ডায়েরি দিয়েছিলেন, শর্ত ছিল-যা লিখব তাকে দেখাতে হবে। কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে মনের আনন্দে লিখতাম। তাতে থাকত দুর্বর্ষ আর রোমহর্ষক সব কাল্পনিক ঘটনার বিবরণ, ওসব পড়ে সেজদি বেশ ভয় পেয়ে যেতেন। তবে আমার লেখালেখির ব্যাপারে তার একটা স্নেহাঙ্গী অনুপ্রেরণা সবসময়ই ছিল।

কিন্তু সেই যুগে, অর্থাৎ আজ থেকে ৫০-৫২ বছর আগে এদেশে শুধু লেখালেখি করে টিকে থাকা ছিল প্রায় অসম্ভব। চাকরি তো করব না, তাহলে আমার জন্যে একমাত্র পথ খোলা রইল ব্যবসা। তখনও জানতাম না, এ দুটোর সমন্বয় কী পরিমাণ খাটুনির কাজ হতে পারে। টের পেলাম যখন, ততদিনে আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই। অবশ্য পিছু হঠতে চাইও নি।

যা-হোক, বাবাকেই প্রথম জানালাম আমার সিদ্ধান্তের কথা। শুনে তিনি কিছুটা আশ্চর্য হলেন, কিন্তু অমত করলেন না। আমার বাবা প্রফেসর ড. কাজী মোতাহার হোসেনের কাছ থেকে সবসময়ই আমরা সবরকম সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তিনি ছিলেন বিচিত্র প্রতিভাদীপ্ত ও উদার মানসিকতাসম্পন্ন একজন মুক্ত চিন্তার মানুষ। গত শতকের গোড়ার দিকে বাংলার মুসলমান সমাজের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার লক্ষ্যে সূচিত 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। স্বাভাবতই তিনি চাইতেন তার সন্তানরাও নিজেদের ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠুক। আমাদের কোনো কাজে তিনি কখনো তিনি বাধা দেন নি। জোর করে নিজের মতামত চাপাতে চেষ্টা করেন নি, বরং সাহায্য করেছেন যথাসাধ্য।

১৯৬৩ সালের মে মাসে বাবার দেয়া ১০ হাজার টাকা নিয়ে কাজে নেমে পড়লাম। আট হাজার টাকায় একটি ট্রেডল মেশিন আর বাকিটা দিয়ে সীসার



টাইপ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনলাম। সেগুনবাগানে আমাদের বাড়ির নিচতলায় যাত্রা শুরু হলো সেগুনবাগান প্রকাশনীর। বছর কয়েক পরে সেগুনের 'সে' আর বাগানের 'বা' নিয়ে এর নাম দাঁড়াল সেবা প্রকাশনী।

শুরু হলো আমার কর্মজীবন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রেসটিকে দাঁড় করাতে রীতিমতো কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে সে-সময়টায়। সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত প্রেসেই থাকতে হতো। তারও আগে-পরে দু-ঘণ্টা করে করতাম লেখা ও অনুবাদের কাজ। সবমিলিয়ে অহোরাত্র পরিশ্রম করতে হয়েছে তখন। প্রথমে একটি বই লিখতাম, তারপর হাতে কিছু টাকা এলে সেটি প্রকাশ করতাম। এভাবে ১৯৬৪ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হলো কুয়াশা-১, এর মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ ঘটল সেবা প্রকাশনীর।

কুয়াশা প্রকাশিত হওয়ার পর এক বন্ধু ইয়ান ফ্লেমিং-এর ডক্টর নো বইটি আমাকে পড়তে দিলেন। ওটা পড়তে গিয়ে মনে হলো, রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী আর অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ঠিক করলাম, বাংলায় ওই মানের থ্রিলার লিখব। তাই বিদেশি থ্রিলার পড়ার পাশাপাশি অভিজ্ঞতা অর্জন ও কাহিনীর প্লট সাজানোর জন্যে মোটর সাইকেলে ঘুরে বেড়লাম চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, কাপ্তাই।

১৯৬৬ সালে প্রকাশ করলাম বাংলায় প্রথম মৌলিক স্পাই থ্রিলার মাসুদ রানা সিরিজের প্রথম বই ধ্বংস পাড়া। বইটি প্রশংসা ও সমালোচনা দুটোই পেলো। দ্বিতীয় বই ভারত নাট্যম প্রকাশিত হওয়ার পর তা লুফে

নিলেন ছেলে-বুড়োসহ সব বয়সী পাঠক। এরপর নতুন বই বের হতে দেরি হলেই আসতে শুরু করল একের পর এক চিঠি। বাকিটা তো সবারই জানা।

অগণিত পাঠকের ভালবাসা আমি আমার পুরোটা লেখক-জীবন জুড়ে নানাভাবে পেয়েছি। বছর কয়েক আগে যেদিন আমার কাজের স্বীকৃতি দিয়ে এক তরুণ পাঠক ওয়েবসাইটে সুদীর্ঘ একটি লেখা প্রকাশ করল এবং আরো অনেকে তাকে সমর্থন জানাল-সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। ধন্যবাদ, তারেক অনু।

প্রতিষ্ঠিত ধারার বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে গিয়ে বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর যে অবস্থান ও সাফল্য, এর মতো ভিন্নধারার একটি প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলার পেছনে আমাদের মূলমন্ত্র ছিল একটাই-আশা করি তা আজকের তরুণদের, যারা নতুন কিছু করতে চায় তাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে পারে-সেটা হলো, পছন্দের কাজ বাছাই করা। অনেকটা না-বুঝেই আসলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম সেদিন, কিন্তু ভালো লাগার কাজ বেছে নেওয়ায় টিকে গেলাম।

আমার ধারণা, নিজের মনের মতো কাজে লেগে থাকলে, দৃঢ়তার সাথে ক্রমাগত পরিশ্রম করে গেলে সাফল্য একসময় আসবেই। আর সেই কাজের ফলে যদি মানুষের উপকার বা আনন্দ হয়, তা হলে তো সোনার সোহাগা। চাই শুধু ধৈর্য ধরে কিছুকাল টিকে থাকা, ব্যস।

রহস্যোপন্যাস রচনার পাশাপাশি বাংলাদেশে আত্ম উন্নয়নমূলক বিভিন্ন রচনা ও এ ধরনের বইগুলোও সাধারণের উপযোগী করে সহজ ভাষায় লিখতে চেয়েছি, যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় লিখেছি, সম্ভবত কঠিন ভাষায় লেখার ক্ষমতা নেই বলেই। আর এ ব্যাপারে আমার অনুপ্রেরণা ছিল : আমি নিজে যা পাঠ করে উপকৃত হয়েছি, আনন্দ পেয়েছি, পাঠককে তার ভাগ দেয়া।

এবং আমার বিশ্বাস, ঠিক এ কারণেই গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক আমাদের সবার প্রিয়। নিজের অর্জিত জ্ঞান ও বিদ্যা তিনি সুন্দরভাবে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন, কঠোর সংগ্রাম ও অদম্য পরিশ্রম করে গড়ে তুলতে চাইছেন সফল ও সার্থক মানুষ। সেই সাথে জীবনটাকে উপভোগ করছেন পরিপূর্ণভাবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনি ভালো
আছেন। আমিও পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায়
বেশ ভালো আছি। শ্রদ্ধেয়া মা-জীকেও আমার সালাম
জানাবেন।

গুরুজী, ছোটবেলা থেকেই কোয়ান্টামের সাথে
জড়িত থাকায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।
কারণ, কোয়ান্টামে না এলে হয়তো আমার জীবনটাই
অন্যরকম হতো। এমনকি আলোর মুখও হয়তো
দেখতে পেতাম না। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড
কলেজ-এ আমি দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় থেকে
পড়াশোনা করেছি। আপনার বিশেষ দোয়ায় আমি
প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল হয়েছি। ছোটবেলা থেকে এ
পর্যন্ত আমি আপনার ছায়াতলে আছি, যা আমার
পরম সৌভাগ্য। এজন্যে স্রষ্টার কাছে সবসময়
শুকরিয়া আদায় করি।

গুরুজী, এ বছর দেশের বিভিন্ন পাবলিক
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আমি অংশ নিয়েছি।
পরীক্ষাগুলোতে আমি বিভিন্ন দিক থেকে অভিজ্ঞতা
অর্জন করেছি। ভর্তি পরীক্ষার সময়গুলোতে আপনার
এবং ফাউন্ডেশনের প্রত্যেকের দোয়া অনুভব করেছি।
এছাড়া আপনার দেয়া বিশেষ অটোসাজেশন-

can I will' আমাকে চমৎকারভাবে সাহায্য করেছে।
প্রস্তুতি এবং পরীক্ষার সময়গুলোতে আমি এ
অটোসাজেশনটি মনে মনে বলতাম। সকলের দোয়ায়
আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছিল।

আমি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম, যে কয়টি
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পরীক্ষা দেবো, সব
কয়টিতে চান্স পাবোই। পরম করুণাময়ের অশেষ
রহমতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ
বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স
পেয়েছি। গুরুজী, এ সাফল্য শুধু আমার একার নয়,
এ সাফল্য পুরো কোয়ান্টাম পরিবারের।

গুরুজী, আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, আমি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ অনুষদের সবচেয়ে ভালো
বিষয় 'ফিন্যান্স' পেয়েছি। গুরুজী, আমার মনছবি
ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া এবং তা সত্যিই
বাস্তবায়িত হলো। এ সাফল্য আপনার দোয়ার
মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

গুরুজী, যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার
ফলে আমি এতদূর এসেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি
হতে পেরেছি, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি
গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের কাছ থেকে আমি
সবসময় একজন সন্তান বা ভাই হিসেবে স্নেহ মমতা

ও আন্তরিক সহযোগিতা
পেয়েছি।

গুরুজী, আপনি যে
আমাকে একটা
আলোকিত জীবন
দিয়েছেন, তার জন্যে
আমি জীবনের শেষ দিন
পর্যন্ত আপনার কাছে
ঋণী হয়ে থাকব।

গুরুজী, আমার জন্যে
দোয়া করবেন-আগামী বছরগুলোতে আমি যেন সুস্থ
দেহ, প্রশান্ত মনে এবং কর্মব্যস্ততায় কাটাতে পারি।
সবসময় ইতিবাচক বলয়ে ও সংস্কে যেন একাত্ম
থাকতে পারি। আরো দোয়া করবেন, আমি যেন
আমার লক্ষ্যে পৌছতে পারি। আমি যেন আলোকিত
মানুষ হয়ে অন্যকে আলোকিত করতে পারি এবং
নিজেকে সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে পারি।
সর্বোপরি আপনার ও মা-জীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু
কামনা করছি।

ইতি

আপনার একান্ত স্নেহভাজন সন্তান
বীর বাহাদুর দ্বিপুত্র



‘খুনি চেয়ার’কে না বলুন ॥ সুস্থতার জন্যে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকুন

যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র মায়ে
ক্লিনিক। এ প্রতিষ্ঠানের মেডিক্যাল নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক
কার্যক্রমের সহ-পরিচালক জেমস লেভিন। পেশায়
এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট লেভিন কয়েক দশক ধরে
মেডিক্যাল এবং দীর্ঘক্ষণ বসে কাটানোর প্রভাব নিয়ে
দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত
বিশ্লেষণ করে তার মতামত হলো-দীর্ঘসময় বসে
নয়, বরং সার্বিক সুস্থতার জন্যে দিনের বেশিরভাগ
সময় দাঁড়িয়ে থাকার বা দৈহিকভাবে সক্রিয় থাকার
অভ্যাস করুন।

লেভিনের মতে, চেয়ারে বসে কাজ কিংবা নিছক
আলস্যবশত অথবা নানা কারণে দিনের একটা বড়
সময় বসে কাটান যারা, দীর্ঘমেয়াদে তারা উচ্চ
রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, মেডিক্যালসহ
নানারকম রোগ-জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে
থাকেন। অন্যদিকে এ সময়টাই যদি কাজ করা যায়
দাঁড়িয়ে বা হাঁটচলার মধ্যে, তবে কমে আসে এসব
রোগঝুঁকি।

এ পুরো বিষয়টি নিয়েই জেমস লেভিন লিখেছেন
তার অনবদ্য গবেষণাগ্রন্থ *গেট আপ!*, এ বছরই যা
প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি উদ্ভাবন করেছেন
বিশেষ ধরনের ট্রেডমিল ডেস্ক, যার ওপর দাঁড়িয়ে
এবং চাইলে ধীরলয়ে হেঁটে ডেস্ক জব বা অফিসের
কাজকর্ম করা যায় নিশ্চিন্তে।

দৈনন্দিন জীবনে হরেক রকম কাজে কিংবা কাজ
ছাড়াও অধিকাংশ সময়ই আমরা বসে কাটাঁই।
চেয়ারে বসে অফিসের কাজ করি, খাওয়াদাওয়া করি,
মিটিংয়ে আলোচনা করি। টিভি দেখা আর আড্ডা
তো আছেই। জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকানরা
তাদের কর্মজীবনের একটা বড় সময় বসেই কাটিয়ে
দেয়-দিনে গড়ে প্রায় ১৩ ঘণ্টা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ এক প্রাণঘাতী ব্যাপার।
২০১০ সালে চিকিৎসা সাময়িকী *সার্কুলেশন* এ বিষয়ে
একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, তাতে বলা হয়-সাত
বছর ধরে ৮,৮০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর
গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, এদের মধ্যে যারা দিনে
চার ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় বসে কাটান তাদের
অকালমৃত্যুর ঝুঁকি ৪৬ শতাংশ বেশি তাদের চেয়ে,
যাদের ক্ষেত্রে এটি সাকুল্যে দু-ঘণ্টার বেশি নয়।

গবেষকদের মতে, দিনের অর্ধেকেরও বেশি সময়
যারা বসেই কাটান তাদের ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে
আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলক দ্বিগুণ। এবং
সর্বমিলিয়ে মৃত্যুঝুঁকি বাড়ে শতকরা ৫০ ভাগ। সব
দেখেশুনে মনে হয়, চেয়ারই বুঝি হয়ে উঠেছে এক
মৃত্যুফাঁদ!

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর কারণটি খুব চমকপ্রদ।
দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা যে স্বাস্থ্যপ্রদ কিছু নয়, তার সূত্র
লুকিয়ে আছে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বে। অর্থাৎ মানবদেহ
এবং এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো এমনভাবে তৈরি ও সজ্জিত
যে, দিনমান সক্রিয় থাকলেই কেবল এর সুস্থতা
নিশ্চিত হয়, অলস শুয়ে-বসে থাকায় নয়। নিক্রিয়তা
বা কম দৈহিক নড়াচড়ায় দেহের বিপাকক্রিয়ার গতি
হয়ে পড়ে ধীর। শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি জমে,
বাড়ে চর্বি'র পরিমাণ। পরিণতি মেডিক্যালসহ আর
হৃদরোগ, উচ্চ কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস,
আর্থ্রাইটিসসহ বিভিন্ন জীবনঘাতী রোগযন্ত্রণা।

এজন্যে গবেষকদের পরামর্শ-খাবার গ্রহণের
পরপরই বসে বা শুয়ে পড়বেন না, তাতে রক্তে বাড়ে
শর্করার পরিমাণ। বরং সচল থাকুন, তাতে রক্তের
শর্করামান থাকবে আপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

অনেকেরই ধারণা যে, বেশি খেলে ওজন বাড়ে
আর খাওয়া কমিয়ে এ নিয়ন্ত্রণ করা যায় সহজেই।



কিন্তু জেমস লেভিন বলছেন, ওজন নিয়ন্ত্রণে এর
চেয়েও সহজতর ও কার্যকর পদ্ধতিটি হচ্ছে নিত্য
সচল থাকা এবং যথাসম্ভব কম সময় বসে কাটানো।
দিনে যখনই সুযোগ পাওয়া যায় তখনই একটু হেঁটে
আসা-বাইরে কিংবা নিদেনপক্ষে ঘরেই হোক-হাঁটতে
হাঁটতে আলাপ-আলোচনা এবং এ জাতীয় কাজগুলো
সেরে নেয়া।

পাশ্চাত্যে সম্প্রতি এ ধারণাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে
উঠেছে। তাই অফিস, কর্মক্ষেত্র, এমনকি স্কুলে পর্যন্ত
এর চর্চা শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। কর্মীদের
সুস্থতা নিশ্চিত করতে অফিস কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করছেন
ট্রেডমিল ডেস্কের। স্কুলে শিক্ষার্থীরা গণিত আর
বানানের ক্লাস করছে টুল-টেবিলহীন ক্লাসে খেলাধুলা
কিংবা দৌড়ঝাঁপ করতে করতে। কোনো কোনো
শহর-কর্তৃপক্ষ স্বল্প দূরত্বে গাড়ি ব্যবহার না করার
জানো জরুরি নাগরিকদের। সংশ্লিষ্টরা
জানাচ্ছেন, এর সার্বিক ফল হয়েছে বেশ চমৎকার।
সুস্থতার হার বেড়েছে দৃশ্যমানভাবে।

তাই, কোনো অজুহাতেই আর বসে থাকা নয়;
আপনিও উঠে দাঁড়ান। হাঁটুন। সচল থাকুন।
আপনার জীবন হোক গতিময় ও কর্মমুখর। সর্বদিক
থেকেই আপনি সুস্থ থাকবেন। হতে পারেন কর্মব্যস্ত
সুখী জীবনের উদাহরণ।

সায়েন্টিফিক আমেরিকান (নভেম্বর ২০১৪)-এ প্রকাশিত
স্বাস্থ্য নিবন্ধ 'কিলার চেয়ার' অবলম্বনে

কামাল লোহানী

সুসংহত সঙ্ঘবদ্ধতাই সবচেয়ে বড় শক্তি



কোয়ান্টামে এসে একটি দৃশ্য আমার খুব ভালো লাগল। দেখি, ছোট ছোট শিশুরা সারি বেঁধে যাচ্ছে আর সমস্বরে বলছে—সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। তাদের এই শৃঙ্খলা এবং কঠোর যে প্রত্যয় তা আমাকে অবাক করেছে। মনে পড়ল ‘আমরা করব জয়’—এই গানটির কথা, যেটা সারা পৃথিবীর মানুষ গায়। আমার মনে হলো, সবকিছুকে জয় করার ইচ্ছা আর শক্তিই যেন আমি এই শিশুদের অর্থাৎ তোমাদের মাঝে দেখছি।

যে আত্মবিশ্বাস আর দক্ষতার সঙ্গে তোমরা প্যারেড প্রদর্শন করলে, তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমাদের মেধার স্ফূরণ আর অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত এই প্রদর্শনী দেখে ১৯৭১-এর চেহারাটা আমার সামনে ফুটে উঠল। রণাঙ্গনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেই তাক করা রাইফেলের কথা মনে পড়ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় লাল-সবুজ পতাকা হাতে চিৎকার করে জয় বাংলার সেই স্লোগানের কথা মনে পড়ে গেল। আজ তোমরা যেন আমাকে দ্বিতীয় জীবন দান করলে।

একটি কথাই তোমাদের বলতে চাই—এ দেশ আমাদের গর্ব, এ মাটি আমাদের কাছে সোনা আর তোমরা এর জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা করে যাচ্ছ তোমাদের কাজের ভেতর দিয়ে। তোমরা দীর্ঘজীবী হও। তোমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করছ, যে সংস্কৃতি লালন করছ নিজের ভেতরে, ভবিষ্যতে সেই সংস্কৃতি এবং চেতনা দিয়ে যেন দেশকে গড়ে তুলতে পারো, দেশকে ভালবাসতে পারো।

একজন মানুষ যদি আত্মবিশ্বাসী হয় এবং তার সত্যতা ও ইচ্ছাশক্তি যদি প্রবল থাকে, তাহলে তার পরাজয় কখনো হয় না।

আমি শুনেছি, কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে তোমরা ১৭টি জাতিগোষ্ঠীর বাচ্চারা আছ। এই যে তোমরা মিলেমিশে লেখাপড়া করছ, সত্যিকারের মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছ তা সত্যিই অসাধারণ। মনে রেখো, এদেশের সব মানুষ এক। আমরা কিন্তু সবাই একসঙ্গে লড়াই করে এই দেশটাকে স্বাধীন করেছি।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ধর্মের কোনো ভেদাভেদ ছিল না, জাতি-গোষ্ঠীর কোনো ভেদাভেদ ছিল না। এটাই আমাদের জন্যে সবচেয়ে বড় গৌরব। আমরা দেশকে ভালবেসে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করেছি, আত্মবিশ্বাস নিয়ে লেগে থেকেছি। এর থেকে বড় পাওয়া আমাদের জন্যে আর কিছুই হতে পারে না।

আমাদের যে বন্ধন, যে নৈকট্য, যে সান্নিধ্য, এটাকে আরো প্রবল করতে হবে, আরো সমৃদ্ধ করতে হবে। নিজেদের মধ্যে যদি আন্তরিকতা থাকে, তাহলে পৃথিবীর যে-কোনো শক্তিকে আমরা পরাজিত করতে পারব। শুধু যুদ্ধ করে দেশটা জয় করলাম, তাহলেই তো হবে না। জাতি হিসেবে সবল হওয়ার জন্যে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, স্বনির্ভর হতে হবে। স্বাধীনতা রক্ত দিয়ে আনা যায় কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করাটা খুব কঠিন ব্যাপার।

লামা কোয়ান্টামে এসে যে অসাম্প্রদায়িক

পরিবেশ দেখলাম, তা আমাকে অভিভূত করেছে। আমার মনে হয়, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি আর অসাম্প্রদায়িকতার একটা সংজ্ঞা তৈরি করেছে কোয়ান্টাম। এখানে সমস্ত মানুষ মিলে সঙ্ঘবদ্ধ চিন্তার বিকাশ ঘটছে। কোয়ান্টাম প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস আর ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করেছে।

এখানে প্রতিটি কাজ হচ্ছে স্ব-অর্থায়নে, যা আমাদের জন্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে স্বনির্ভর হয়েই প্রতিটি কাজ করা সম্ভব। আসলে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংহত শক্তির চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু হতে পারে না। তাই আমাদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, নিজেদের নৈকট্য আর পারস্পরিক সৌহার্দ্যকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে। কারণ এ দেশকে সত্যিকারের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই।

আমরা সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি—একথা শুধু মুখে বললে হবে না। কাজের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে।

তোমরা কোয়ান্টামে সঙ্ঘবদ্ধতা আর যৌথ প্রয়াসের যে অনুপ্রেরণা পেয়েছ, তা তোমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ একদিন তোমরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে। তখন কোয়ান্টামের এই বাণী, এই চিন্তাধারা তোমরা সবার মাঝে ছড়াতে পারবে। এ দেশটাকে জননী হিসেবে ভালবাসাই হলো কোয়ান্টামের চিন্তাধারা। আর এই ভালবাসার শক্তিকে আমাদের অর্জন করতে হবে।

আমরা ছোটবেলা থেকে শুনেছি, জননী জন্মভূমি স্বর্গদপী গরিয়সী। এই স্বর্গদপী গরিয়সীর শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে তোমাদের তৈরি হতে হবে। গুরুজী তোমাদের নিয়ে, এই দেশকে নিয়ে যে মহান স্বপ্ন দেখছেন, সেই স্বপ্ন পূরণের সৈনিক হতে হবে তোমাদের প্রত্যেককে।

দেশ-বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তোমাদের



সাফল্যের কথা, ক্রীড়াশৈলীর কথা আমি শুনেছি এবং আনন্দিত হয়েছি। জয়ের জন্যে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা, অঙ্গীকার এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্যেই তা সম্ভব হচ্ছে। তোমাদেরকে আত্মনির্ভর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে কোয়ান্টামের যে উদ্যোগ ও অবদান তাকে আমি অভিনন্দন জানাই। যেখানেই যাও না কেন, মানুষকে ভালবাসার এবং একে-অপরের সঙ্গে সুসম্পর্কের যে সংস্কৃতি তোমাদেরকে শেখানো হচ্ছে তা মনে রাখবে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন—একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন, তা যেন তোমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারো। তোমরা বেড়ে ওঠো, সমৃদ্ধ হও, এই মাটিকে ভালবাসতে শেখো এবং মাটির মানুষগুলোকে একভাবে দেখতে শেখো, এটাই আমার প্রত্যাশা।

দুই দিনব্যাপী কোয়ান্টাম সফরকালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এ বক্তব্য দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম স্থপতি ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী।



কোয়ান্টাম শিশুসদনের ফুদে কন্যা শিশুদের সাথে

কোয়ান্টাম সফরে দেশের দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

কাজই নেতিবাচকতা বিনাশ করে
জীবনে সত্যিকার আনন্দ আনে

একটা বইয়ে পড়েছিলাম গল্পটা। এক লোক, তার ছেলে হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা গেল। লোকটা সেই কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না। অসহ্য সে কষ্ট। তিনি ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছেন। এই যখন অবস্থা, তার ছোট মেয়েটা একদিন বলল, বাবা আমাকে একটা নৌকা বানিয়ে দেবে?

মেয়ের আবদার রাখতে তিনি নৌকা বানাতে বসলেন। এবং কয়েক ঘণ্টা ধরে কাঠ কেটে জোড়া দিয়ে একটা নৌকা বানালেন। তারপর মেয়ের হাতে দিলেন সেটা। সেই মুহূর্তে হঠাৎই তার মনে হলো, ছেলে মারা যাওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো কয়েকটা ঘণ্টা তিনি দুঃখের হাত থেকে বেঁচে ছিলেন। অনেকটাই শান্তিতে ছিলেন।

তিনি এর উত্তর খুঁজতে চাইলেন এবং বুঝলেন, গত কদিনে এই কয়েকটা ঘণ্টাই কেবল তিনি তার ছেলেটার কথা ভাবেন নি। কেন ভাবেন নি? ভাবার কোনো সময় তিনি পান নি। কেন? কারণ তিনি চিন্তা করে দেখলেন, মানুষ যখন কাজ করে তখন সে একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারে না। আমি কবিতাও লিখছি, আবার রসগোল্লাও খাচ্ছি। দুটো কি একসঙ্গে হয়? সুতরাং যখন তিনি নৌকা বানাতে গেছেন, তিনি কাজের মধ্যে ঢুকে গেছেন, মগ্ন হয়ে থাকেছেন। ফলে সমস্ত দুঃখ শোক যন্ত্রণা তিনি ভুলে ছিলেন ওই সময়টুকুতে। সময়টা তার ভালো কেটেছে।

এই বাস্তব উপলক্ষটাই তাকে বাঁচিয়ে দিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমি কাজ করব। যতক্ষণ কাজ করব, ততক্ষণ তো অন্তত আমি শান্তি পাব। কষ্ট ভুলে থাকতে পারব। তিনি কাজ শুরু করলেন। একসময় ঠিকই পুত্রশোক তিনি কাটিয়ে উঠলেন।

সুতরাং দেখুন, কাজ মানুষকে কীভাবে বাঁচিয়ে দেয়। দেখবেন, যে যত বেশি কাজ করে সে তত ভালো থাকে। আনন্দে থাকে। সবরকম নেতিবাচকতা থেকে সে মুক্ত থাকে। একটা ইতিবাচক অনুরণন তাকে ঘিরে থাকে সবসময়।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে আমাদের, সেটি হলো, যে কাজ করে সেই সফল হয়। ধরা যাক, একটা দিনে আমরা ২২টা কাজ করি। তার মধ্যে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয় কয়টা? আমার তো মনে হয় এমন একেকটা দিন যায় কোনো ব্যর্থতাই হয় না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে কি আপনি ব্যর্থ

হয়েছেন? আপনি কি নাশতা করতে ব্যর্থ হয়েছেন? আপনি কি অফিসে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন? অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে যতগুলো কাজ হাতে নিয়েছিলেন, তার কয়টাতে ব্যর্থ হয়েছেন? অধিকাংশই সুন্দরভাবে করতে পেরেছেন, হয়তো সবগুলোই।

অতএব, চিন্তা করে দেখুন, একটা দিনে প্রায় কোনো কাজেই আমরা ব্যর্থ হই না। তবু আমি ধরলাম যে, দিনে ২২টা কাজ যদি আমি করি তাহলে অন্তত দুইটা কাজে আমি ব্যর্থ হতে পারি। অর্থাৎ ২০টা কাজে আমি সফল হলাম। ২০টা কাজে আমি সফল হলাম মানে ২০টা আনন্দ আমার সেদিন হলো। ২০টা আনন্দ আমি পেলাম একদিনে। তো, একদিনে যদি আমি ২০টা আনন্দ পাই তাহলে এক মাসে কতগুলো আনন্দ পাবো? ৬০০ আনন্দ। এক বছরে? ৭২০০ আনন্দ। ৬০ বছর যদি আমি বাঁচি তাহলে কতগুলো আনন্দ হবে আমার সারা জীবনে? প্রায় পাঁচ লক্ষ আনন্দের সাগরে ভাসতে ভাসতে আমি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। সেদিন এ পৃথিবীর বিরুদ্ধে কি আমার কোনো অভিযোগ থাকবে? আমি পারি নাই, আমার হয় নাই, আল্লাহ আমাকে আর কয়টা দিন সময় দাও-এমন কোনো আক্ষেপ কিংবা অতৃপ্তি কি আসবে? আসবে না।

মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ তার গানে লিখেছেন,



১ম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়দের সাথে সজ্জীকৃত অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, কোয়ান্টাম সফরে

সমুখে শান্তি পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার। আমার সামনে শান্তির সমুদ্র, হে ঈশ্বর, আমার তরণী ভাসিয়ে দাও। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন তপ্তি নিয়ে চলে যেতে পারি। কিন্তু আমরা সবাই কি সেটা পারি? মৃত্যু এলে কি বলতে পারি, যে, আল্লাহ, আজ আমার বড় আনন্দ, লক্ষ লক্ষ আনন্দের সাগরে ভাসতে ভাসতে আমি সুখে পরিপূর্ণ হয়েছি। আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারি না। কেন? কারণ, আমরা ফাঁকি দিয়েছি। আমরা সময়ের কাজ সময়ে করি নি। অসংখ্য কাজ আমাদের অসমাপ্ত রয়ে গেছে। জীবন পড়ে আছে অদক্ষিত অবস্থায়। একটা

মোমবাতির সাফল্য কোথায়? শুধু দাঁড়িয়ে থাকায়? না, জ্বলে জ্বলে তার আলোয় চারপাশকে আলোকিত করায়। এটাই তো মোমবাতির সাফল্য। আমাদের জীবনের সাফল্য কী? কাজের ভেতর দিয়ে, কাজের আনন্দের ভেতর দিয়ে জ্বলে জ্বলে একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ায়।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছিলেন, আমি এক জীবনে দুই জীবনের কাজ করে গেলাম। তো, মৃত্যুর সামনে এই মানুষের দুঃখ থাকবে কীভাবে? দুঃখ তো আমরা যারা ফাঁকিবাজ, তাদের। আমরা যারা কাজ ফেলে রেখেছি। সময় চলে গেছে, কাজ করি নি। অনেক কিছু অসমাপ্ত, অনেক কিছু অসম্পূর্ণ থেকে গেল। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই-ই তো অল্প সময় নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি। ষাট সত্তর আশি নব্বই, বড়জোর একশ, এই তো। সক্রিটিস, প্রোটো, এরিস্টটল, নিউটন, আইনস্টাইন, এমনকি রসুল (স), গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রিষ্ট-তারা কি কেউ এর চাইতে বেশি সময় পেয়েছিলেন? আর দশজন সাধারণ মানুষের সাথে এদের পার্থক্যটা কোথায় তাহলে? পার্থক্যটা হলো কাজে। এসব বড় মানুষেরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন। কাজের আনন্দে বেঁচে থেকেছেন। জীবনকে ব্যবহার করে গেছেন সুপূর্ণভাবে।

আমরাও যদি জীবনকে ওভাবেই ব্যবহার করি, জীবনকে প্রজ্জ্বলিত করি, জ্বালিয়ে রাখি, কাজ দিয়ে ভরিয়ে তুলি, কাজের আনন্দে মেতে থাকতে পারি তাহলে এই মানবজীবন ফুলেফলে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এবং মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তখন আমরাও হাসতে হাসতে চলে যেতে পারব পরকালে। আর যদি সেটা না করি, তবে নিশ্চয়ই তার শাস্তি থাকা উচিত। শুধু যে পাপের শাস্তি থাকা উচিত, তা তো না; আমি মনে করি, আলসেমিরও শাস্তি থাকা

উচিত। সময়ের কাজ সময়ে না করার শাস্তি থাকা উচিত। আর সমস্ত আলসেমি, অক্ষমতাকে জয় করা যায় কেবল কাজ দিয়ে।

আমি বলি, কাজ হচ্ছে গঙ্গাজল। কাজই মানুষকে দুঃখের হাত থেকে বাঁচায়। হতাশা, বিষণ্ণতা, ভয় ইত্যাদি নেতিবাচকতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কাজ এমনই এক আশ্চর্য জিনিস, যা মানুষকে ক্রমাগত এক ইতিবাচক কর্মশক্তি ও উজ্জীবনে আলোকিত করে রাখে।

১২ নভেম্বর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টার আয়োজিত বিশেষ ওয়ার্কশপে এ বক্তব্য দেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

প্রশ্ন » ? » উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমি একটি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছি। জয়েন করার পর থেকে আমার চেয়ারম্যান মাঝে মাঝেই আমাকে ডেকে বলেন এই কোম্পানি ছেড়ে না যেতে-তিনি আমাকে ইন্ডাস্ট্রি করে দেবেন। একদিন হঠাৎ করে আমাকে ডেকে বললেন, আমার বিয়ের দায়িত্ব তিনি নেবেন, এতে আমার কোনো সমস্যা আছে কিনা? আমি কোনো সমস্যা নেই বলে জানাই। তারপর বলেন, তিনি আমাদের বাসায় যাবেন, বাবা-মার সাথে কথা বলবেন। কয়েকদিন পর আবার বলেন, তিনি আমাকে গার্মেন্টস করে দেবেন। আমি যেন তার দুই ছেলেকে নিয়ে ব্যবসা করি। এই কথাটি তিনি বার বার বলেন। কিন্তু গুরুজী, আমার কথা হচ্ছে, তিনি আমাকে চেনেন না, জানেন না, আমার জন্যে এত ভালবাসা কেন? গুরুজী, আমি খুবই কনফিউজড।

উত্তর : আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং ভালো-মন্দ বোঝার বয়স আপনার হয়েছে। আপনি যে এখন পর্যন্ত টোপ গিলে ফেলেন নি তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, বুদ্ধিগন্ধি আপনার আছে। মনে রাখবেন, বিয়ের দায়িত্ব সবসময় নিজে নেবেন, কারণ সংসার করবেন আপনি। তাই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি মাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছেন, চেয়ারম্যান সাহেব বিয়ের দায়িত্ব নিচ্ছেন, তার মানেটা কী? আপনাকে কী কারণে গার্মেন্টস বানিয়ে দেবেন? যদি পাঁচ/দশ বছর কাজ করতেন, তারপর আপনার কাজে তিনি অনেক সম্মত হতেন, তাহলেও তা একটা কথা ছিল। অতএব খুব সতর্ক থাকবেন। তবু ভালো যে, আপনি কিছু একটা সন্দেহ করছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন। এজন্যে ধন্যবাদ।

এ ধরনের প্রস্তাব কিন্তু ছেলে/মেয়ে যে-কারো ক্ষেত্রেই আসতে পারে। যে প্রস্তাবই আসুক, আগে ভালো করে খোঁজখবর নেবেন, বিবেচনা করবেন। আর বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আপনার, এটা ঠিক। কিন্তু হতে হবে পরিবারের সম্মতিতে। এবং অবশ্যই পরিবারকে বোঝাতে হবে-কেন আপনি হাঁ বলছেন। পরিবারকে রাজি করিয়ে বিয়ে করবেন। আবার পরিবার কাউকে পছন্দ করল কিন্তু আপনার যদি পছন্দ না হয়, তাহলে সরাসরি বলবেন, আমার মন টানছে না। কারণ বিয়ের পরে আনন্দ যা সেটাও আপনার, কষ্ট যা সেটাও আপনার। কেউ এটা শেয়ার করতে আসবে না। পারবেও না। এক্ষেত্রে খেয়াল করবেন-যার সাথে আপনার বিয়ের কথা হচ্ছে, তাকে দেখে আপনার মন টানছে কিনা। ভেতরে ক্লিক করছে কিনা। আর পছন্দ হলে তো শৌকর আলহামদুলিল্লাহ!

প্রশ্ন : মাটির ব্যাংকে এত দান করছি কিন্তু সমস্যার সমাধান হতে দেরি হচ্ছে। প্রায় তিন মাসে ১০/১৫ হাজার টাকা দিয়েছি।

উত্তর : মাটির ব্যাংকে আপনি কেন দান করছেন, সেটা আপনার কাছে খুব পরিষ্কার থাকতে হবে। আপনি আপনার মঙ্গলের জন্যে, আপনার কল্যাণের জন্যে দান করছেন। তিন মাসে ১০/১৫ হাজার টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ আপনার দানকে কবুল করুন। কিন্তু এই যে এত টাকা দিলাম কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না-যখন একথা বলছেন তখন দানটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দানের বরকত কমে যাচ্ছে। বরং

দান করার পরে বলবেন, আল্লাহ আমার যা সামর্থ্য ছিল আমি তো দান করেছি। তুমি বলেছ, দান করলে তুমি বহুগুণে তার প্রতিদান দাও। তুমি এই অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করো। অর্থাৎ যিনি এইহীতাকে সবসময় অনুন্নয়কারী হতে হবে। বলতে হবে বিনম্রচিত্তে। এইহীতার আসলে দাবি থাকে না। দাবি থাকলেও দাবির পেছনে অনুন্নয় থাকে। কোনো শক্তি বা অভিযোগ থাকে না। উদ্ভূত তো নয়ই।

আল্লাহ তায়ালা সবসময় তাকেই পছন্দ করেন- তাঁর কাছে যে সারেন্ডার করে, অনুন্নয় করে, বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করে। বিনয়ের সাথে যখন প্রার্থনা করবেন তখন আপনি প্রার্থনার সাথে একাকার হয়ে যাবেন। আর আপনি যদি মনে করেন এত দিয়ে ফেলেছি-আপনার হিসাবে ১০/১৫ হাজার টাকা হয়তো অনেক টাকা-কিন্তু আল্লাহর তো আপনার টাকার প্রয়োজন নেই। আপনার টাকা আপনি আল্লাহর ওয়াস্তে দিচ্ছেন বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে। আল্লাহ এতে খুশি হয়ে যে-কোনো বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি দিতে পারেন।

সেজন্যে সবসময় আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করবেন। কত দিলেন তা উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনার নিয়ত ও বিপদ-মুক্তির জন্যে আপনার আন্তরিক ইচ্ছা। আপনার সামর্থ্যের মধ্যে দেবেন। আনন্দচিত্তে দেবেন, যে, আল্লাহ বলেছেন সাদকা দিতে-আমার যা ছিল আমি দিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই আমাকে উদ্ধার করবেন। এই বিশ্বাসটাকে প্রবল রেখে দান করবেন। উপকার হবে। আর যদি হিসাব করতে থাকেন যে, এত দিলাম, এখনো হলো না, আপনি পিছিয়ে পড়লেন। এটা সং দান হলো না।

প্রশ্ন : মেডিটেশন করতে পারছি না। প্রি-সেলেও যাওয়া হচ্ছে না। এজন্যে নয় যে, আমি ব্যস্ত। ইচ্ছেটা অনেক কমে গিয়েছে। গুরুজী, আমার অনেক ভয় হচ্ছে। জীবনের মানে আর এর লক্ষ্যটা যেন ভুলে যাচ্ছি। সবকিছু এলোমেলো লাগছে। এমন কেন হচ্ছে? আমি একজন ভালো মানুষ হতে চাই। মানুষকে ভালবাসতে চাই।

উত্তর : এই যে চাওয়া-এই ইচ্ছাশক্তিকে আরো গভীরভাবে জাগ্রত করতে হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি ব্যস্ত না কিন্তু ইচ্ছা অনেক কমে গিয়েছে-এই যে ইচ্ছা কমে যাওয়া, ভালো কিছু করার ইচ্ছা কমে যাওয়া আর মুতু-এ দুয়ের মাঝে খুব একটা তফাত নেই। মানুষ পৃথিবীতে বৈষয়িক কিংবা আত্মিক যা-কিছু করেছে, সে কিন্তু তার এই ইচ্ছাকে জাগ্রত করেই করেছে। সেজন্যে প্রথমেই আলস্য, ইচ্ছাহীনতা আর নিষ্ক্রিয়তার বৃত্তটা আমাদের ভাঙতে হবে। বার বার ভাঙতে হবে।

আপনি মেডিটেশন করতে পারছেন না। এটা হচ্ছে একটা বৃত্ত। নিজের গালে কষে চড় দিন কয়েকটা। যদি মনে করেন নিজে জোরে দিতে পারবেন না, আরেকজনকে ভাড়া করুন। তাকে বলুন, জোরে যদি চড় মারতে পারো, আঙুলের দাগ থেকে যায়, তাহলে ১০০ টাকা পাবে। সে যদি বলে, ১০০ টাকায় এত জোরে চড় দিতে পারব না, তাহলে ৫০০ টাকা দিন। জোরে চড় খেয়ে যেন মনে থাকে যে, এই কাজটা আমার করা উচিত ছিল কিন্তু আমি করি নি। যা করা উচিত বলে মনে করবেন তা কেন করতে পারবেন

না? যে-করেই হোক নিষ্ক্রিয়তার বৃত্ত বা আরাম বলয়টা ভাঙতে হবে। কেন বৃত্তে জড়িয়ে যাবেন? একের পর এক বৃত্ত ভেঙ্গে মুক্তির রাজপথে উঠতে হবে। আর বৃত্ত ভাঙার জন্যে যে শক্তি দরকার, স্ট্রীট সেটা আপনার মধ্যেই দিয়ে রেখেছেন।

এখন আপনি নিজেই যেহেতু বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন, অবিলম্বে সকল আলস্য বেড়ে ফেলে সাদাকায়ন, আলোকায়নে নিয়মিত অংশ নিন। আমরা দোয়া করি, আপনি যাতে আবার নিয়মিত মেডিটেশন শুরু করতে পারেন।

প্রশ্ন : প্রকৃতির প্রতিদান বা ল'জ অব ন্যাচারাল রিটার্ন সম্পর্কে আমরা জেনেছি। প্রশ্ন হলো, একটি অন্যায় করার পর যদি প্রচণ্ড অনুশোচনা হয়, তাহলে কি প্রকৃতির শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়? এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

উত্তর : আন্তরিক অনুশোচনা এবং সে অন্যায়টা জীবনে আর না করা-এতে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু শুধু এটুকুতে আপনি প্রকৃতির শাস্তি থেকে বেঁচে যাবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ, যদি আপনার অন্যায়ের ফলে আরেকজন কোনো অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়ে থাকে, আপনি যত অনুশোচনা করেন, তাতে তার ক্ষতিপূরণ না-ও হতে পারে।

ধরুন, আপনি একটা খুন করে ফেলেছেন। তারপর যত অনুশোচনা করেন, কিন্তু যাকে স্বামীহারা করলেন, যাকে পিতৃহারা করলেন, যাকে সন্তানহারা করলেন, আপনার অনুশোচনা কি তাদের স্বামী বা পিতাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে? কখনো পারবে না। প্রকৃতির প্রতিদান থেকে বাঁচবেন কিনা তা নির্ভর করে অন্যায়টা কীরকম, তার ওপর। অন্যায়টা যদি নিজের সাথে হয়, অনুশোচনা করলে এবং সেই অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি না করলে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু অন্যায়টা যদি অন্যের ওপরে হয়, তবে সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া দুষ্কর। তারপরও আল্লাহ যে-কোনো কিছু ক্ষমা করে দিতে পারেন, যদি আন্তরিক অনুশোচনা ও তওবা করেন।

প্রশ্ন : ছেলের বিয়েতে অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছি। এর মধ্যে কিছু আপনজন আছে, যারা দাওয়াতে আসে নি। তাদের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এর থেকে মুক্তি পেতে পারি কীভাবে?

উত্তর : আসলে এখানেই আমরা ভুল করি। আমি দাওয়াত দিয়ে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু সে আসে নি, সে তার দায়িত্ব পালন করে নি। কিন্তু সেজন্যে আমার কেন ক্ষোভ হবে? কেন আমি অপমানিত বোধ করব? যেরকম আমরা সবসময় বলি যে, গালি যে দিলো অপমানিত বোধ করবে সে, আমি কেন অপমানিত বোধ করব?

সাধারণভাবে এ চিন্তাটা আমরা করতে পারি না। অথচ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া চাই এটাই যে, দাওয়াত দিয়ে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন; সে আসে নি, ওটা তার সমস্যা। আপনি বলুন, শৌকর আলহামদুলিল্লাহ! এলে ভালো লাগত, কিন্তু আসেন নি যে, তাতে খারাপ বা কম ভালো কিছু হয় নি। অর্থাৎ জিনিসটাকে খুব সহজভাবে নেবেন, তাহলেই কোনো সমস্যা থাকবে না।

১ম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ চ্যাম্পিয়ন

কোয়ান্টাম স্পোর্টসিয়াম

নির্ধারনী খেলায় কোয়ান্টারা ৩৩-২৫ গোলে পরাজিত করে ফেইম বয়েজ ক্লাবকে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ খেলাটি এটিএন বাংলায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ১ম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ ২০১৪-তে আটটি দল অংশগ্রহণ করে। কোয়ান্টারা প্রতিটি ম্যাচে জয়লাভ করে লিগের সর্বোচ্চ ২১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। তারা টুর্নামেন্টে মোট ৭৬ গোলের বিপরীতে ২৮৩ গোল করে। লিগের দলীয় সর্বোচ্চ ৫২ গোলের রেকর্ডও কোয়ান্টাদের।

এছাড়া এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৫ গোলসহ মোট ৬৭ গোল করেন অধিনায়ক কোয়ান্টা দালিয়ানখুম লুসাই, যা টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ। ১ম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে কোয়ান্টাম স্পোর্টসিয়াম হ্যান্ডবল দল ২০১৫ সাল হতে ক্লাব পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা প্রিমিয়ার ডিভিশন হ্যান্ডবল লিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

শিক্ষার্থীদের ধ্যানসাফারি



আরোগ্যশালায় মেডিটেশনে মগ্ন শিক্ষার্থীরা

১৪ ও ১৫ নভেম্বর কোয়ান্টামমে অনুষ্ঠিত হয় একটি বিশেষ ধ্যানসাফারি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার শিক্ষার্থীরা অংশ নেন এই ব্যতিক্রমধর্মী ধ্যানসাফারিতে। দেশের ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৭৫ জন শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ধ্যানসাফারিটি পরিণত হয় চমৎকার এক মিলনমেলায়।

শিক্ষার্থীরা কোয়ান্টামম ভ্রমণ, প্রকৃতির সান্নিধ্যে মেডিটেশন, জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়ক চমৎকার কিছু আলোচনা, গ্রুপ ডিসকাশন ও প্রেজেন্টেশনে অংশ নেন। নিজের অমিত সম্ভাবনাকে অনুধাবন, সাফল্যের নেপথ্য রহস্য, সফল জীবন গড়তে সঠিক জীবনচারণ অনুসরণ, মডেল নির্বাচনের গুরুত্ব এবং সংসঙ্গে একাত্ম থাকার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয় দুই দিনের এই আয়োজনে।

নিউইয়র্কে প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপ

২৫ ও ২৬ অক্টোবর নিউইয়র্ক-এর জ্যাকসন হাইটস-এ প্রো-মাস্টারদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি ইউএসএ-এর উদ্যোগে 'রহমম শোকারানা' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপটি গুরুজীর পরিচালনায় অডিও-র মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ২৫ জন প্রো-মাস্টার, যা আমেরিকাতে এ পর্যন্ত প্রো-মাস্টারদের সর্বোচ্চ উপস্থিতি। এছাড়াও আমেরিকান বাঙালিদের মাঝে কোয়ান্টামের বাণী পৌছে দিতে এবছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আলোকায়ন কার্যক্রম।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টামম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। অগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

২৪-৩১ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১ম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ ২০১৪-তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের কোয়ান্টাদের নিয়ে গঠিত দল কোয়ান্টাম স্পোর্টসিয়াম। ১০ নভেম্বর শিরোপা

কেয়া গ্রুপের ৬৭ জন রক্তদাতাকে সম্মাননা প্রদান

২৪ নভেম্বর সোমবার কেয়া গ্রুপের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ১১৩ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। বিভিন্ন সময় কেয়া গ্রুপে আয়োজিত কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের ব্লাড ক্যাম্পে রক্তদান করেছেন এমন ৬৭ জন (পুরুষ ৬১ জন, মহিলা ৬ জন) রক্তদাতাকে আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা জানানো হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেয়া গ্রুপের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী পরিচালক আলহাজ্ব আক্বাহ আলী পাঠান এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন প্রধান অতিথি আলহাজ্ব আক্বাহ আলী পাঠান

গাজীপুরে চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোয়ান্টাম সভা



১২ নভেম্বর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গাজীপুর শাখার উদ্যোগে চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম সভা। একঘণ্টাব্যাপী এ সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর (ডুয়েট), কাজী আজিম উদ্দীন কলেজ, কসমিক কলেজ এবং হাতেখড়ি পাবলিক স্কুলে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে সভাগুলোতে সুখী ও সফল জীবন গড়তে মেডিটেশনের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল। চারটি কোয়ান্টাম সভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ৭১০ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক।

মতিঝিল ও উত্তরা শাখার বার্ষিক ওয়ার্কশপ

১৫ নভেম্বর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মতিঝিল শাখার উদ্যোগে কাকরাইল মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপে আলোচনা করেন আর্ডেন্টিয়ার মওলানা ছায়ীদুল হক ও মগবাজার শাখার মোমেন্টিয়ার সি.এম কামরুন্নাহ মুনীর। মতিঝিল শাখার মোমেন্টিয়ার অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব-এর সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করেন আর্ডেন্টিয়ার রেহানা আক্তার রুমা। গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার মিলিয়ে উপস্থিতি ছিলেন মোট ১১৬। ২১ নভেম্বর উত্তরা শাখায় অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ওয়ার্কশপ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাতিরপুল শাখার মোমেন্টিয়ার মমিনুল ইসলাম ও নিকেতন প্রি-সেল-এর আস্থায়ক শাহনাজ বেগম। ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করেন উত্তরা শাখার মোমেন্টিয়ার মিসেস শামসুন নাহার হুদা। গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার মিলিয়ে উপস্থিতি ছিলেন মোট ১১৬। বার্ষিক ওয়ার্কশপে আলোচনার বিষয় ছিল 'সাফল্যের রহস্য : মনোযোগায়ন' ও 'নিজে ভালো থাকতে এবং চারপাশের ৪০ ঘর ভালো রাখতে আগামী দুই মাস করণীয়।'।



চট্টগ্রামে দিনব্যাপী কোয়ান্টাম ওয়ার্কশপে গুরুজী অন্তর্গত নেতিবাচকতা দূর করার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে

সাফল্য হলো একটা শক্তি অর্জনের নাম। সাফল্য এমন এক শক্তি, শক্তির এমন স্তরে প্রবেশ করা যেখানে যে-কোনো চাওয়াকে আমরা পাওয়ার প্রক্রিয়ায় ফেলে দিতে পারি। পাওয়ার প্রক্রিয়ায় যখন এটা একবার ঢুকে যায়, তখন এর গন্তব্য হচ্ছে পাওয়া। তবে অবশ্যই সে চাওয়াটা যৌক্তিক হতে হবে, সঠিক হতে হবে এবং নিজের কাছে পরিষ্কার হতে হবে। ২৮ নভেম্বর চট্টগ্রামে জিইসি কনভেনশন

সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'সাফল্যের নেপথ্য শক্তি' শীর্ষক ওয়ার্কশপে এ কথাগুলো বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, আমরা সবাই চাই কিন্তু অধিকাংশ মানুষই পাই না কেন? কারণ বেশিরভাগ মানুষ নিজের মধ্যে নেতিবাচকতা সৃষ্টি করে কিন্তু তা দূর করার দায়িত্ব নিজে নিতে চায় না। আর যে নিজে নিজেকে সাহায্য করে না, তাকে আল্লাহ তায়ালাও সাহায্য করেন না।

পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ সফল মানুষের সন্তানদের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কারণ মা-বাবার মতো তাকে কষ্ট করতে হয় নি। আসলে সোনা হলেই তা অলংকার হয় না। সোনা তখনই অলংকার হয়, যখন একে পোড়ানো হয়, পেটানো হয়। যে সোনা যত পোড়ানো হয়, পেটানো হয়, সেটা তত সূক্ষ্ম, তত খাঁটি, তত দামী হয়।

সাধারণ মানুষ পরিশ্রমকে কষ্ট মনে করে। অথচ পরিশ্রম আর কষ্ট এক নয়। পরিশ্রম তো আনন্দের ব্যাপার। মানুষ পরিশ্রম করলে তাকে আরো উৎসাহ দেয়া উচিত, সমবেদনা নয়। কারণ জীবনের চাওয়াগুলোকে পূরণ করতে প্রয়োজন পরিশ্রম।

যা চাই তা-ই পাবো-এ কথাটি তখনই সত্য হবে যখন আমরা বলব-আমি পারি আমি করব। অর্থাৎ সাফল্যের জন্যে অন্তর্গত নেতিবাচকতা দূর করার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে।

আমি পারি আমি করব-এই প্রত্যয় অনুরণিত হয় ঢাকার বাইরে এই সর্ববৃহৎ ওয়ার্কশপে। মূল হলের বাইরে আয়োজন করা হয় মেডিটেশন ভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টার ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এসোসিয়েট উপভোগ করেন এই আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

এছাড়াও ওয়ার্কশপে আগত গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টারদের দেড় শতাধিক শিশু-কিশোর সন্তানদের দেখাশোনা করার জন্যে ছিল ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন কিডস কর্নার। দিনভর হাসি-আনন্দ-খেলায় মুখর কিডস কর্নারে আয়োজন করা হয় শিশুদের কুইজ প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি তেমন সাজো, হাসির প্রতিযোগিতা ও জাদু প্রদর্শনী।

অনবদ্য উৎসবমুখর এই আয়োজনের নেপথ্যে হাসিমুখে কাজ করে গেছেন কোয়ান্টাম পরিবারের একঝাঁক উদ্যমী কোয়ান্টিয়ার ও দায়িত্বশীল। চট্টগ্রাম ও এর পার্শ্ববর্তী স্থান ছাড়াও কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি থেকেও ওয়ার্কশপে অংশ নিতে আসেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা।



কিডস কর্নারে হাসি-আনন্দে উচ্ছল শিশুদের একাংশ

কর্মসূচি ৯ ডিসেম্বর ২০১৪

বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালা

১২ ও ১৩ ডিসেম্বর। বনশ্রী

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রম

১২ ও ১৩ ডিসেম্বর। মিরপুর

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন

১২ ও ১৩ ডিসেম্বর। কেন্দ্র

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট কোয়ান্টায়ন

১২, ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম

২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর। বনশ্রী

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম

২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর। প্রশান্তি হল (মহিলা)